সত্যি কি?

সৌম্যজিৎ রায়

সত্যিই তো, সত্যি কি? আমাদের সেই ছোটবেলা বেলা থেকে শিখে আসা, সত্যি বলবে, সত্যি শুনবে, কিন্তু সত্যি জিনিসটা আসলে কি? আমাদের জীবনে সত্যি কি? আমাদের জানার পরিসীমায় সত্যি কতটা? কথাগুলো ভাবতে থাকলে একটা অন্য সুর বেজে ওঠে। প্রকৃতির চোখে সত্যি কি? একটু ভেবে দেখলে প্রকৃতির চোখে সব কিছুই অনেকটা 'কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা'র খেলা! সব কিছুই পরিবর্তনশীল। অথচ, তার মুলে একটা সুর। কি সেই সুর? কি বা সেই সত্যি? তারই খোঁজ এখানে।

একটু ভেবে দেখলে আমাদের সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথী প্রকৃতির চোখে একধরণের 'কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা'র খেলা। আর তার মুল সুর: একটা অপরিবর্তনীয় অবক্ষয়। শক্তির অবক্ষয়। প্রকৃতির চোখে। একটু অন্যভাবে দেখলে আমাদের সেই দিনের যেটুকু পাওয়া বা হারানো বা পরিবর্তন, প্রকৃতির চোখে তার ও মুল সুর শক্তির নিক্তিতে সেই একই অপরিবর্তনীয় অবক্ষয়। তবে প্রকৃতির চোখে নিত্য কি? পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের গহণে শুধুই এক কালাতীত অবক্ষয়ের কান্না। তবু প্রকৃতি নির্বিকার। নিরুত্তাপ। আসি কল্পনার বাস্তবে। ধরা যাক সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে সৃষ্টি সঙ্গীত। কি দেখছি? প্রথমে অন্ধকার। তারপর হঠাৎ একটা সিঁড়ি। একটা শিশু। তার মা। আর অসংখ্য গোল গোল বল। এবার এক অবাক ঘটনা। শিশুটি কয়েকটা বল নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই মুহূর্তে যোগ হল আরেকটা সিঁড়ির ধাপ আর অনেক সব গ্রহ, নক্ষত্র। এত্তসব কান্ডের পর, মা সব বলগুলো কুড়িয়ে আনলে দেখলাম যে কটা বল শিশুটি ছুঁড়েছিল সে কটা বল মা ফিরে পেলেন ঠিকই কিন্তু তাদের আয়তন গেল কমে। অর্থাৎ, বলা চলে বলগুলোর সংখ্যাগত মান এক থাকলেও গুণগত মান গেল কমে। আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম, তা আসলে প্রকৃতিতে একদম শুরুর দিকে এক অণুমুহূর্তে ঘটে যাওয়া ঘটনা। এখানে শিশুটি সেই সময়ের ঘটমান নানান ঘটনা আর মা হলেন স্বয়ং প্রকৃতি। বলগুলোর সংখ্যা মোট শক্তির পরিমাপ। বলগুলোর আয়তন, শক্তির গুণ। তাই এই সৃষ্টির খেলার প্রতি ধাপে শক্তির মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলেও তার গুণ

স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কমে। আসলে সৃষ্টির খেলার এই দুই ধর্ম তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্সের দুই সূত্র। প্রথম সূত্র বলে: বিনি-পয়সায় দুনিয়ায় কোথাও খাওয়া জোটে না! বিজ্ঞানের পরিভাষায়, এই বিশ্ব-সংসারে যেকোনো প্রক্রিয়ার শুরু আর শেষে শক্তির পরিমাণ থাকে অপরিবর্তিত। আর আমাদের গল্পে, খেলা যাই হোক না কেন, খেলা শেষে বলের সংখ্যা থাকবে একই। দ্বিতীয় সূত্র বলে: এই বিশ্ব-সংসারে শক্তির গুণগত মান যেকোনো প্রক্রিয়ার শুরু আর শেষে এক থাকে না। তা ক্রমশঃ কমেই চলে। এই গুণগত মানের বিজ্ঞানের পরিভাষায় আবার এক পোশাকী নাম আছে: এন্ট্রপী বা ইংরেজী অক্ষর S। প্রকৃতিতে সম্ভাবনা, যার জার্মান পরিভাষা Wahrscheinlichkeit (W), একটি বিশেষ জায়গা নিয়ে থাকে। লুডভিক এডোয়ার্ড বোল্টসমান প্রথম দেখান যে কোনো (আদর্শ) গ্যাসের এন্ট্রপী তার একই রকমের অণুগুলোর বিভিন্ন অবস্থায় থাকার সম্ভাবনার সঙ্গে এক গাণিতিক সম্পর্কে ($\log_e$) যুক্ত:

$$S = k \log_e W$$

চিত্র ১: বোল্টসমানের ভিয়েনার সমাধির ওপর লেখা: $S = k \log_e W$.

বিজ্ঞানের পরিভাষায় থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র বলে: বিশ্ব-সংসারে যেকোনো প্রক্রিয়ার শেষে এন্ট্রপীর মান সব সময় উর্দ্ধমুখী। অন্যভাবে বলা চলে, যেকোনো প্রক্রিয়ার শেষে শক্তির গুণগত মান ক্রমশঃ কমেই চলে। আর আমাদের গল্পে, খেলা যাই হোক না কেন, খেলা শেষে বলের আয়তন বা গুণ যাবে কমে। আর তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে চলেছে একটাই ঘটনা: শক্তির গুণগত মান ক্রমশঃ চলেছে কমে। পায়ে পায়ে রয়েছে এক অবক্ষয়। সত্যি এটুকুই। বোল্টসমানের ভিয়েনার সমাধির ওপর লেখা প্রকৃতির সম্ভাবনার সঙ্গে এন্ট্রপীর সম্পর্ক যেন কোন গভীর অর্থহীন হাসিতে আজো আমাদের ভাবিয়ে তোলে। (চিত্র ১)।

ফিরে যাই আমাদের গল্পের সময়ের সিঁড়িতে। সময়ের সিঁড়ি বয়েই চলেছে। চলেছে সেই ছড়িয়ে ফেলা, কুড়িয়ে আনার খেলা। আর সেই খেলার জেরে কোনো এক সিঁড়ির পাশে হঠাৎই তৈরী হচ্ছে এক ভাইরাস। সেখান থেকে বহুদূরে এক ব্যাক্টেরিয়া। আর তারো লক্ষ-কোটি সিঁড়ির পাশে কোথাও হাসছে বনমানুষ, তারো বেশ কিছুদূরে আজকের মত মানুষ। সিঁড়িটা নিম্নমুখী। যেমন করে নিম্নমুখী আমাদের শক্তির গুণ। সিঁড়ি বইছে ওপর থেকে নিচের দিকে। তার বয়ে চলার মুল সুর মা আর শিশুর বল নিয়ে খেলা করা। নতুন নতুন জিনিস বা জীব-জন্তু, গাছ-পালা, পোকা-মাকড় সেখানে তৈরী হচ্ছে এ ধাপে ওধাপে। তবু সমস্যা একটাই। ওই সিঁড়ি বেয়ে নিচ থেকে ওপরে ওঠা অসম্ভব বাস্তবে। তবে কল্প-বিজ্ঞানের টাইম-মেশিন বা মনের কল্পনায় সেখানে নিচ থেকে ওপরে বা ওপর থেকে নিচে চলা-ফেরায় কোনো বাধা নেই! কিন্তু বাস্তবে সময়ের সিঁড়ি বইছে নদীর স্রোতের মত। এক দিকে। অনন্ত। বিশ্রামহীন অবক্ষয়ের মোহনায়। অথচ সেই অবক্ষয়ের মুলসুরকে শ্রদ্ধা করেই সিঁড়ির পাশে কখনো বা উঠছে হরপ্পা মহেন্জোদারো, কখনো ব্যবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান, কোণার্কের সূর্যমন্দির, চন্ডাশোকের ধর্মাশোক হয়ে ওঠা, বা কোথাও বেজে উঠছে বীঠোফেনের নবম সিম্ফনী, আরো দুরে জাপানের বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা কাটিয়ে আজকের জাপান হয়ে উঠে ফুকুশিমার বিপর্যয় বিধ্বস্ত হওয়া। সবই চলেছে সমানে সিঁড়ির

এপাশে ওপাশে আর মা-শিশুর খেলার সাথে সাথে। চলছে ছড়িয়ে ফেলা, কুড়িয়ে আনা। মুলসুর: পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের গহণে অবক্ষয়।

অবশ্য অবক্ষয়ের মাঝে আসে বিস্ময়। বিস্ময় আমাদের বেঁচে থাকা বা আরো স্পষ্ট করে বললে আমাদের অস্তিত্ব নিয়েও। যেমন, ধরা যাক, আমাদের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমান। শতকরা ২০ ভাগ। অথচ এই পরিমান যদি শতকরা ২৩ ভাগ হোতো তবে আমাদের দুনিয়া আজ মানবশূণ্য উত্তপ্ত উষর উদ্যান হয়ে উঠত। তাই অবাক লাগে কিভাবে নিঁখুত গণণায় আমাদের অস্তিত্বের পরিকল্পিত রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। আরো অবাক লাগে জীবনের অস্তিত্বের সামগ্রিক ছবিটার কথা ভাবলেও। আর এই সবই ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তিলে তিলে অবক্ষয়ের কাঁটার টিক টিক করে খুব আস্তে বয়ে চলার সাথে সাথে। আসি জীবনের অস্তিত্বের সামগ্রিক ছবিটার কথায়। জীবনের অস্তিত্বের মূল পটভুমিতে রয়েছে দুটি অনুষঙ্গ। প্রথমটি গঠণমূলক। দ্বিতীয়টি, কর্মমূলক। তাই জীবনের অস্তিত্বর অবাক বিস্ময়ের অনুধাবনে দুটি অনুষঙ্গই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

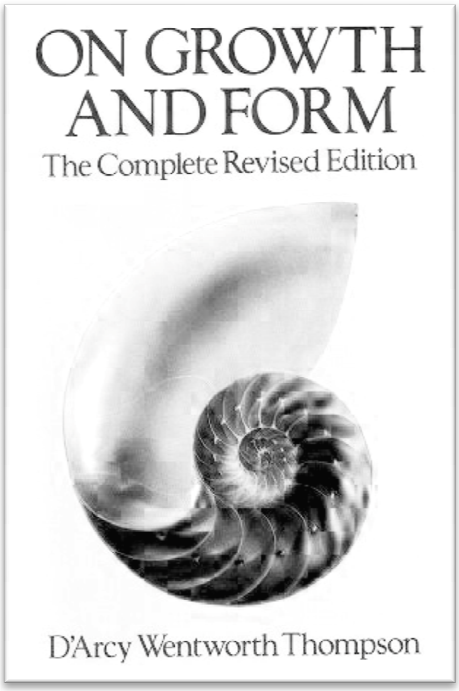

চিত্র ২: ডার্সি ওয়েন্টোয়ার্থ থমসনের বই “On Growth and Form”.

আসা যাক জীবনের গঠণমূলক অনুষঙ্গের কথায়। এই প্রসঙ্গে প্রথম দিকের ভাবনা অনেকটাই সার্ধশতবর্ষ আগের বিজ্ঞানী ডার্সি ওয়েন্টোয়ার্থ থমসনের। তাঁর অন্যবদ্য বই “On Growth and Form” এ তিনি প্রকৃতিতে শক্তির নিরিখে জীবনের গঠণমূলক উন্মেষের দিকটা তুলে ধরেছেন। (চিত্র ২)। তাঁর কথায়, "An organism is so complex a thing, and growth so complex a phenomenon, that for growth to be so uniform and constant in all the parts as to keep the whole shape unchanged would indeed be an unlikely and an unusual circumstance. Rates vary, proportions change, and the whole configuration alters accordingly." একটা সহজ আর ছোট্টো উদাহরণ দেখা যাক। ধরা যাক, জেলীফিশের গঠণের কথা। জেলী ফিশের সৌখিন সাজানো শরীরের অস্তিত্বের অনেকটাই প্রকৃতির বলের সাম্যের রীতি রাখার নিয়মে বাঁধা। কিভাবে? একটা মানস পরীক্ষা করা যাক। ধরা যাক, একটা পাত্রে খুব ঘন একটা তেল রাখা আছে। এবার সেই পাত্রের গভীরে গিয়ে কয়েকটা ফোঁটা জলের বুদবুদ যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে অনেকটা জেলীফিশ-সদৃশ আকার আস্তে আস্তে সেই গভীরে তৈরী হচ্ছে। সহজ কথায়, প্রকৃতির বলের সাম্যের রীতি রাখার নিয়মে। এখানে অভিব্যক্তি বা অভিযোজনের কথায় না গিয়েও জেলীফিশের মত জীবনের গঠণের কথা ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য সেই শুরু তারপর বহু বিজ্ঞানী অনেক সুন্দর সুন্দর পরীক্ষায় দেখিয়েছেন কিভাবে জীবনের সদৃশ গঠণ পরীক্ষাগারে তৈরী করা সম্ভব। একটা নতুন গবেষণার ক্ষেত্রও তৈরী হয়েছে। যার পোশাকী নাম: Biomimetics.

এবার আমরা আমাদের পরীক্ষাগারে তৈরী করা এক ঝুড়ি মটরশুঁটি দেখে ক্ষান্ত হবো। না বায়োমিমেটিকস নয়, বরং রসায়ণের হাত ধরে। কিভাবে? এক ধরণের অণু আমরা তৈরী করতে পারি যাদের মধ্যে দুটো সুস্পষ্ট অংশ আছে। এবার এরা যে নিজেদের একে অন্যকে খুব পছন্দ করে এমন নয়। তবে রসায়ণের সাহায্যে এদের একসাথে বসিয়ে অনেকটা আটকে এই অণুকে রসায়ণাগারে বানানো সম্ভব। এর রসায়ণে

একটা খটোমটো পোশাকী নাম আছে: $PMo_{12}O_{40}$ বা $(PO_4)(MoO_3)_{12}$ । যার মানে একটা PO_4 আর ১২ টা MoO_3 হাত ধরাধরি করে বসে আছে। কিন্তু এদের মধ্যে বেশ কিছুটা অপছন্দ। তাই একটু সুযোগ পেলেই এরা হাত ছেড়ে তৈরী করবে শুরুর PO_4 আর MoO_3। অথচ এই হাত ছাড়াছাড়ির মাঝে কি হতে পারে কোনো সুন্দর সংগঠণ? আর তা দেখতে আমরা সাজিয়েছিলাম একটা ছোট্টো পরীক্ষা। (চিত্র ৩)।

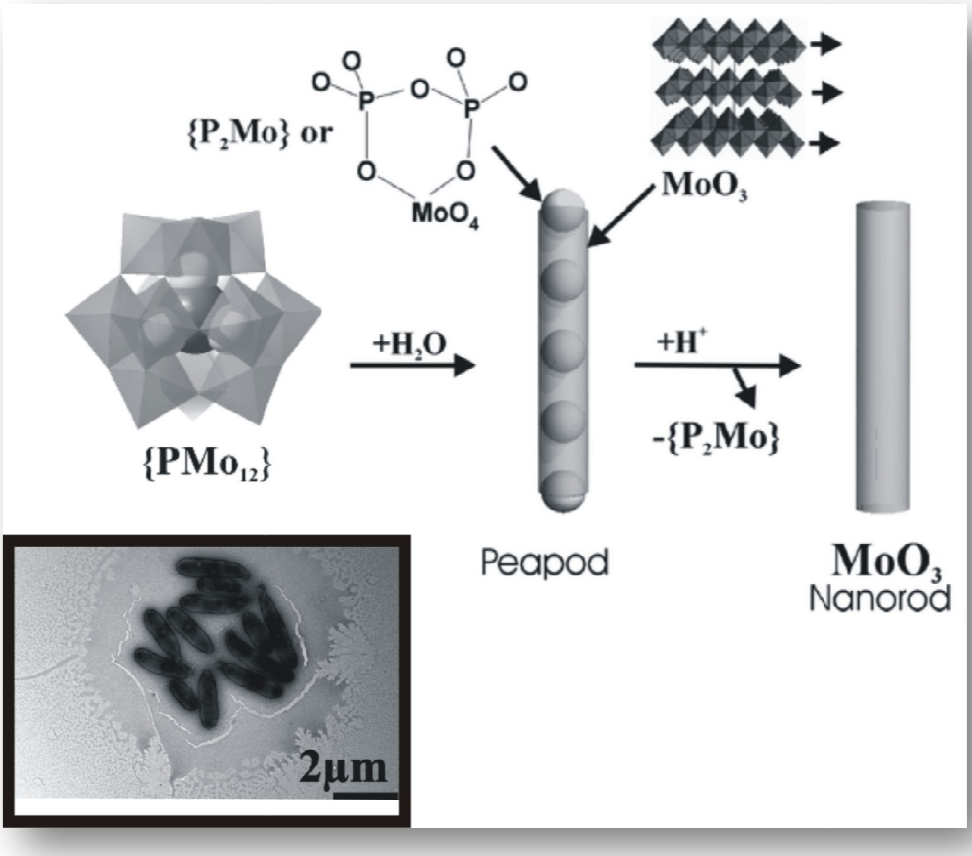

চিত্র ৩: অণু সাজিয়ে মটরশুঁটি তৈরী করা। ইনসেটে মাইক্রোস্কোপের আলোয় দেখা অজৈব মটরশুঁটি।

পরীক্ষাটা অনেকটা এরকম। অণু আর বড়সড় যেকোনো পদার্থর মাঝে যে বিশাল জায়গাটা পড়ে আছে, বিজ্ঞানের পোশাকী নামে 'ন্যানো আর ম্যাক্রো'র মাঝের অঞ্চলে অনেক সুযোগ কোনো সুন্দর আকার তৈরী হওয়ার। $PMo_{12}O_{40}$ বা $(PO_4)(MoO_3)_{12}$ এ একটা PO_4 আর ১২ টা MoO_3 হাত ধরাধরি করে বসে আছে। এদের মধ্যে বেশ কিছুটা অপছন্দ। তাই হাত ছাড়াছাড়ি হলেই তৈরী হতে পারে কোনো সুন্দর সংগঠণ। আর তাই আমরাও দেখতে চাইলাম, কি হয় আমাদের অণুর ক্ষেত্রে যদি হয় হাত ছাড়াছাড়ি, ওই 'ন্যানো আর ম্যাক্রো'র মাঝের অঞ্চলে? [এখানে বলে রাখা ভালো, ন্যানো আর ম্যাক্রো দুয়েরই জন্ম দৈর্ঘ্য বোঝানোর একক থেকে। ন্যানো বা ন্যানোমিটার, এক মিটারের প্রায় দশ কোটি ভাগের এক ভাগ! আর ম্যাক্রো বলতে বোঝায় অন্ততঃ মাইক্রোমিটার বা তার বেশী। মাইক্রোমিটার আবার এক মিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ।] 'ন্যানো আর ম্যাক্রো'র মাঝের অঞ্চলে কি করে আমাদের স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত অণু, তা দেখতে আমরা শুধু উস্কে দিলাম একটা ভৌত-রাসায়ণিক সংগ্রাম। কি দিয়ে? শব্দের ব্যবহারে। অর্থাৎ, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ধরে এক বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘের শব্দ ওই অণুর এক জলীয় সংমিশ্রণে বেশ কিছুক্ষণ চালাতেই দেখা গেল ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যের অণু নতুন করে সেজে উঠল অনেকটা অজৈব মটরশুঁটির মত করে! কারণ? সেটা খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি আমাদের আনুমান, যে PO_4 আর MoO_3, শব্দ শক্তির সাহায্যে নড়ে চড়ে বসে নতুন ভাবে: অজৈব মটরশুঁটির মত করে। (চিত্র ৩)। যেখানে, PO_4 মটরদানায় বাসা বাঁধে আর তার চারপাশে তাকে জড়িয়ে থাকে MoO_3। কারণ: PO_4 এর পছন্দ গোল মটরদানা, আর MoO_3 চায় তার থাকে থাকে সাজানো ক্রিস্টালের সুন্দর পরিবেশ। এ যেন, অণুরই এক রূপান্তরিত পরিবর্তন, যার সঙ্গে এক হাল্কা মিলে কোনোভাবে মিশে যায় জেলীফিশের জন্মবৃত্তান্তের ভৌত পরীক্ষার ফলটুকু। তবে এসবই মনের মাঝে মিলের খোঁজে। বাস্তবে এদের মাঝের ব্যবধান মটরশুঁটি আর জেলীফিশের মতই অনেকখানি! অর্থাৎ সহজ রাসায়ণিক পরীক্ষায় আমরা জীবনের

সদৃশ সংগঠণ সহজেই তৈরী করতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন নেই কোনো জিনের অভিব্যক্তি বরঞ্চ তাতে আছে এক রাসায়ণিক অভিব্যক্তি। এখন প্রশ্ন ওঠে জিনময় জীব জগতে জিনাতীত কিছু ঘটা কি সম্ভব?

সাম্প্রতিক জীববিদ্যা যেন অনেকটা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আসি জীবনের কর্মমূলক অনুষঙ্গের কথায়।

HGT বা Horizontal Gene Transfer, হল এমনি এক ঘটনা যেখানে জিন স্থানান্তরিত হয় এক জীব থেকে অন্য জীবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বাইরে। এখন এমন পরিবেশে দেখা যায় আরেক অদ্ভুত ঘটনা। প্রাকৃতিক বা পারিপার্শিকের চাপের শিকার হলে এক প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া স্বচ্ছন্দে অন্য প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া থেকে জিন নিয়ে তাকে আত্তীকৃত করে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ তার জন্য আরেক প্রজন্ম অপেক্ষার তার আর কোনো দরকার থাকে না। আজকাল আমাদের মাঝে যে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না, তার কারণও এই HGT বা Horizontal Gene Transfer। অর্থাৎ, জিন আজকের জগতে HGT বা Horizontal Gene Transfer এর আলোয় বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে বা বিশেষ করে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া আর পরিবেশের মধ্যে অনাদিকাল ধরে চলতে থাকা কথোপকথনের এক ভাষা মাত্র! আর এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রশ্ন ওঠে তবে বিজ্ঞানের নিরিখে সত্য কি? উত্তর। পরিবর্তন। আর তাই বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে এক অন্যতম সত্যি: ধারণার পরিবর্তন। এর বিস্তারকে আবার রিচার্ড ডকিন্স তাঁর বই ‘সেলফিশ জিনে‘ তুলনা করেছেন আর সংজ্ঞায়িত করেছেন ‘আই-জিন‘ এর ধারণার মাধ্যমে। যেকোনো নতুন ভাবনা বা ধারণা আমাদের মধ্যে আজকাল প্রসারলাভ করে খুব দ্রুত। তার জন্য প্রয়োজন নেই কোনো প্রজন্মের অপেক্ষার। বরং ইন্টারনেট বা বইয়ের পাতায় আমাদের জ্ঞানের আহরণ-বিতড়ণ-প্রসার ও বটে। আর এই প্রসারের একক ডকিন্সের কথায় ‘আই-জিন‘ বা ‘মেম’ (Meme)।

'আই-জিন' থেকে আসা যাক আরেক আইডিয়ার কথায়। বিজ্ঞানের জগতে তার নাম ক্রিটিক্যালিটি। এবার এই ক্রিটিক্যালিটির দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা জিজ্ঞেস করবো সত্যি কি? এখন প্রশ্ন ক্রিটিক্যালিটি কি? সোজা বাঙলায় ক্রিটিক্যালিটি বলতে আমরা বুঝি সংকটময়তা বা সংকটমুহূর্ত। আর একটু গুছিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোনো পদার্থের সংকটমুহূর্ত বলতে কি বোঝায়, তখন বলা যেতেই পারে যে মুহূর্তে বা যে বিন্দুতে কোনো পদার্থের অবস্থার সংকট এসে হাজির হয় তাকেই বলা যায় সেই পদার্থের সংকটমুহূর্ত বা তার সংকটবিন্দু। একটা সহজ উদাহরণে জিনিসটা বোঝা যাক। ১৮৬৩ সালে থমাস এন্ডরুশ এক সহজ পরীক্ষায় প্রথম কোনো পদার্থের সংকটবিন্দু পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করে দেখান। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিয়ে তিনি তার ওপর ক্রমশঃ চাপ দিতে দিতে এমন এক অবস্থায় পৌঁছন যেখানে শুধু গ্যাসই নয়, তরল কার্বন ডাই অক্সাইডও এক সাথে উপস্থিত। কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে বায়ুমন্ডলের চাপের ৭৩ গুণ চাপে আর ৩১.১ ডিগ্রী তাপমাত্রায় এই সংকটমুহূর্ত দেখা যায়। এখন কেনই বা এমন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আরেকটু গভীরে উঁকি দিতে হয়। যেকোনো পদার্থের অবস্থার গভীরে লুকিয়ে অণুর বিন্যাস। কঠিণের ক্ষেত্রে অণুগুলো ঠাসাঠাসি করে বসে থাকে, অনেকটা ভিড় যাত্রী বোঝাই বাসের মত। কাজেই যেমন বাসের দরজার কাছে কেউ জোরে ঠেলা দিলে দূরে দাঁড়ানো যাত্রীও সেই ধাক্কার জের টের পান, তেমন করে কঠিণ পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলোর ওই বজ্র-আঁটুনি বাঁধুনির জন্যই কঠিণ পদার্থ অত কঠিণ! আবার কঠিণে অণুগুলোর সংখ্যাগত ঘনত্ব ও বেশ নিয়ম মেনে চলে। কারণ, বাস ভর্তি থাকলে আমরা বাধ্য হই একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে। সহজ পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় কজন কতটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ভর্তি বাসে এক জায়গায় লোকের ঘনত্ব আর এক কোণে লোকের ঘনত্বও বলা যায় বেশ সহজে। কারণ এই দুই ঘনত্ব সম্পর্কিত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় correlated। তাই আবার একই কথা একটু ঘুরিয়ে পুনরাবৃত্তি করলে কঠিণ পদার্থের এক ধর্ম উঠে আসে। যেকোনো কঠিণের অণুর সংখ্যার ঘনত্ব সমস্ত কঠিণের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত। এই সংখ্যাগত ঘনত্বের তারতম্য কঠিণের ক্ষেত্রে খুবই কম বা নগণ্য।

বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই তারতম্যের নাম fluctuations বা density fluctuations। বলাই বাহুল্য, তরলের ক্ষেত্রে এই তারতম্য, কঠিণের থেকে অনেক বেশী, কারণ তরলের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগত ঘনত্ব কম। আর গ্যাসের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ঘনত্ব খুবই কম আর সংখ্যাগত ঘনত্বের তারতম্য সব থেকে বেশী। এখানে বলে রাখা ভালো সংকটবিন্দুতে সংখ্যাগত ঘনত্বের তারতম্য সব থেকে বেশী। আর তাই, পদার্থের নতুন কোনো সমষ্টিগত ধর্মের উন্মেষের সম্ভাবনাও সংকটবিন্দুতে সর্বাধিক! আর সেখানেই ক্রিটিক্যালিটির গুরুত্ব। এবার সহজ কথায় দেখা যাক ওপরের পর্যবেক্ষণ। ধরা যাক একটা বাস তার উৎস-স্থল সল্টলেক থেকে শিয়ালদা হয়ে তার গন্তব্য ডালহৌসী যাচ্ছে। একদম শুরুর দিকে বাসটা ফাঁকা। কজন মাত্র যাত্রী। এবার বাসটা যত শিয়ালদার দিকে যেতে থাকবে তত তার যাত্রী সংখ্যা বাড়বে। এটা অনেকটা এন্ডরুশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে পরীক্ষায়, গ্যাসের ওপর চাপ বাড়ানোর সমতুল্য। যত চাপ বাড়ে তত অণুর সংখ্যাগত ঘনত্ব বাড়ে। ঠিক বাসটার ধীরে ধীরে শিয়ালদার দিকে এগোনোর মত। বাসটা যতই শিয়ালদার দিকে এগোয়, ততই বাড়ে যাত্রী আর কমে যাত্রীদের দাঁড়ানোর স্বাধীনতা। এবং ধীরে ধীরে একটা যাত্রী সংখ্যার ঘনত্বের নির্দ্দিষ্ট ধরণ বা প্যাটার্ণ তৈরী হয়। ঠিক যেমন করে এন্ডরুশ সাহেব তাঁর পরীক্ষায় চাপ বাড়িয়ে গ্যাসকে তরলীকৃত করেন, তেমন করেই আমরা বলতে পারি যাত্রী বাড়িয়ে আমরা বাসেও একই ভাবে সেই অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়েছি। গ্যাস থেকে যেন এসেছি তরলে! আগের অবস্থার তুলনায় বাসের যাত্রীদের সংখ্যাগত ঘনত্বের তারতম্য গেছে কমে। এবার ধরা যাক বাসটা এলো শিয়ালদায়। হঠাৎ বহু যাত্রী নামলেন, বহু যাত্রী উঠছেন। বাসের ভিতর একটা চূড়ান্ত অবস্থা তৈরী হলো। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ানো কেউ বসতে পেলেন না আবার হঠাৎ উঠেই কেউ গেলেন বসে! যাত্রীদের সংখ্যাগত ঘনত্বের তারতম্যও পৌঁছলো চূড়ান্তে। বলা যায় শিয়ালদায় পৌঁছে বাসটা পৌঁছলো সংকটবিন্দুতে, সেখানে যাত্রীদের সংখ্যাগত ঘনত্বের তারতম্যও চরমে। মনের আয়নায় চট করে মিলিয়ে নিই এন্ডরুশ সাহেবের

পরীক্ষা। বাসের অবস্থা তখন কার্বন ডাই অক্সাইডের মত! যখন কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলের চাপের ৭৩ গুণ চাপে আর ৩১.১ ডিগ্রী তাপমাত্রায়। অর্থাৎ বাসের ছবিটা ক্রিটিক্যালিটির দ্যোতক!

এই ক্রিটিক্যালিটির গুরুত্ব বোঝাতে এসে পড়ে সুপারকন্ডাক্টারের কথা। এর পাশাপাশি জড়িয়ে 'ন্যানো আর ম্যাক্রো'র মাঝের অঞ্চলের অনেক সুযোগের কথাও। একটা ছোট্ট উদাহরণে জিনিসটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ধরা যাক সোনা আর নায়োবিয়াম নামের দুই ধাতুর কথা। এদের দুয়ের পরমাণুগুলো একই রকমের। সোনার মাঝের ইলেক্ট্রনগুলো এক পরিবাহী তরল তৈরী করে আর তাই সোনা, সোনা! চকচকে, তড়িতের সুপরিবাহী। ৩০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত সোনা আর নায়োবিয়ামের পরমাণুগুলোর ব্যবহার একইরকম। আর তার পরেই শুরু হয় প্রকৃতির এক আশ্চর্য খেলা। ৩০ ন্যানোমিটারের পর নায়োবিয়ামের ইলেক্ট্রনগুলো জোড়া বাঁধে। এই ধরণের জোড়া বাঁধা প্রথম আবিষ্কার করেন ১৯৬৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী লিওন কুপার। তাই এই ধরণের জোড়াকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় কুপার জোড়া বা Cooper pair। আর আস্তে আস্তে আমরা যত ন্যানোমিটার ছেড়ে মাইক্রোমিটারের দিকে এগোই তত অসংখ্য কোটি কোটি কুপার জোড়া এক সাথে হয়ে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় এক অন্যধরণের ক্রিটিক্যালিটি: সংখ্যা আর আয়তনের ক্রিটিক্যালিটি! আর এই নতুন অবস্থায় নায়োবিয়াম রূপান্তরিত হয় অতিপরিবাহীতে বা সুপারকন্ডাক্টারে। এই অবস্থায় বিনা রোধে তড়িৎ পরিবাহিত হয়। চৌম্বকক্ষেত্র হয় অনেকটাই বহিষ্কৃত, আর তাই চুম্বকের ওপর রেখে দিলে এই নতুন অবস্থার নায়োবিয়াম ভাসে! সাধারণ নায়োবিয়াম হয়ে ওঠে অতিপরিবাহী। সৌজন্যে: সংখ্যা আর আয়তনের ক্রিটিক্যালিটি!

সুপারকন্ডাক্টার যত আর্কষণীয়ই হোক না কেন, তা প্রাণহীন। এবার আমরা আবার কল্পনার জগতে একটা ছোট্ট ডুব দেবো। সঙ্গী ক্রিটিক্যালিটি। আমরা আগেই দেখেছি জীবনের উন্মেষের দুটো প্রধান অনুষঙ্গ। গঠণমূলক আর কর্মমূলক। কিন্তু আজকে আমাদের বর্ধিত জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আমরা অনায়াসে এই দুই অনুষঙ্গকে

আলাদা করে না দেখে অনেকটা একই ছবির দুই অঙ্গ হিসেবে দেখতে পারি। আমরা আজ পৃথকভাবে জীবন-সদৃশ গঠণমূলক স্থাপত্য সহজ রসায়ণের প্রয়োগে তৈরী করতে সক্ষম। আবার HGT আর Meme এর মত জীবনের কর্মমূলক অনুষঙ্গের প্রেক্ষিতেও আজ আমাদের জ্ঞান অনেকখানি। প্রশ্ন ওঠে: কোনোভাবে এই দুই অনুষঙ্গের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনে কি কোনো নতুন অবস্থা তৈরী করা সম্ভব? তাই কি জীবন? হয়তো এই দুই মাত্রার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনে ক্রিটিক্যালিটির দিকে চোখ রেখে আমরা পৌঁছতে পারি নতুন উন্মেষের সীমান্তে! (চিত্র ৪)। বিজ্ঞানের চোখে তবে সেটাই হয়ে উঠতে পারে একটা সুন্দর সত্যি।

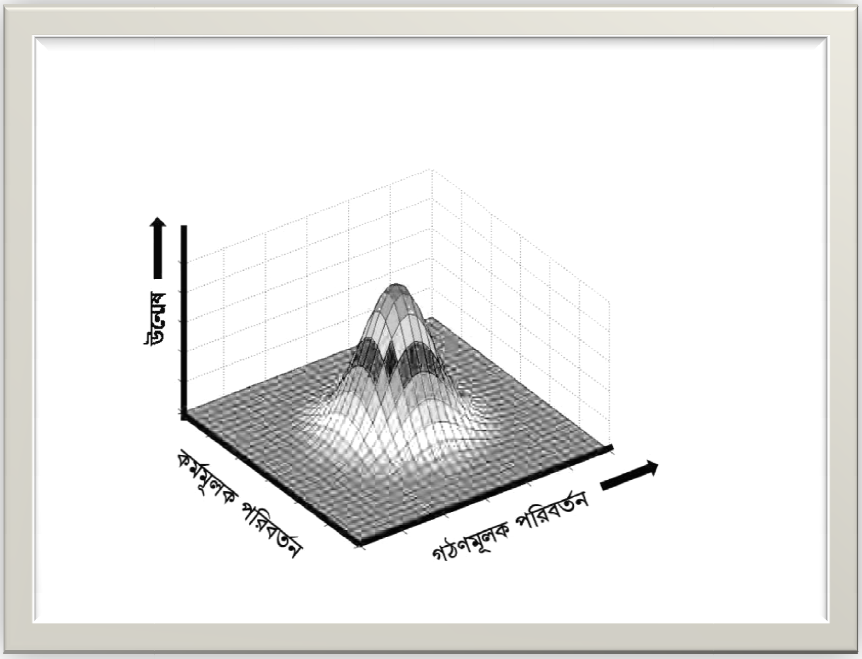

চিত্র ৪: উন্মেষের দুটো প্রধান অনুষঙ্গ। গঠণমূলক আর কর্মমূলক।

ঘড়িটা টিক টিক করে চলেছে। জিজ্ঞেস করছে যেন, তবে সত্যি কি? পরিবর্তন, তার মূলের অবক্ষয়? তবে মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের সীমার প্রেক্ষিতে হয়তো এই অবক্ষয় ভাবনা একান্ত আত্মিক হয়ে ওঠে না।

তবে ব্যক্তি মানুষের কাছে সত্যি কি? হয়তো সত্যি প্রতি অনুমুহূর্ত। অবক্ষয়, মৃত্যুকে জীবন দিয়ে অতিক্রম করে বেঁচে থাকার সৌন্দর্যই সত্যি। সুন্দর।

লেখাটি ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার এক অন্যতম প্রাণপুরুষ আইসার কলকাতার (IISER-Kolkata) অধ্যাপক বিদ্যেন্দুমোহন দেবকে উৎসর্গীকৃত।

তথ্যসূত্র:

1. *The Feynmann Lectures on Physics*, Addison Wesley Longman, 1970.

2. Richard Dawkins, *The Blind Watch Maker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design*, W. W. Norton and Co. Ltd., London, 1996.

3. Richard Dawkins, *The Selfish Gene*, Oxford University Press, 3rd Edition, USA, 2006.

4. Phillip Ball, *The Self-Made Tapestry: Pattern Formation in Nature*, Oxford University Press, 2001.

5. D'arcy Wentworth Thompson, *On Growth and Form*, (Ed. John Tyler Bonner), Cambridge University Press, (Abridged Edition) 1992.

6. S. Roy, *et al. Langmuir*, 23 (2007) 5292.

7. Nigel Goldenfeld and Carl Woese, *Nature*, 445 (2007) 369.

8. N. Frigaard, A. Martinez, T. Mincer and E. DeLong, *Nature* 439 (2006) 847.

9. M. Sullivan, *et al. PLoS Biol.* 4, (2006) e234.

10. M. Pedulla, *et al. Cell* 113 (2003) 171.

11. K. Vetsigian, C. Woese and N. Goldenfeld, *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 103 (2006) 10696.

12. P. Coleman, *Nature* 446 (2007) 379.

13. P. W. Anderson, *Science* 177 (1972) 393.

14. P. Coleman and A. Schofield, *Nature* 433 (2005) 226.

15. R. B. Laughlin, *A Different Universe*, Basic Books, 2005.

16. J. Davis, http://musicofthequantum.rutgers.edu